ভোরের কাগজ

16

তারিখ ... FEB 24 2000 ...
পৃ ... 4 ... 8 ...

এখনো গেল না আঁধার

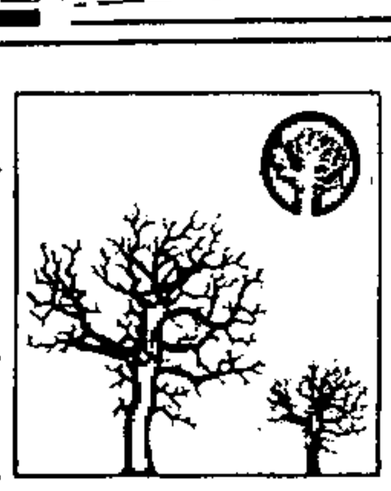

ওয়াহিদুল হক

সরকারের রাম-ফাঁকির একুশে

বইমেলা বাণিজ্যমেলা গ্রামীণ শত রকমের মেলা মানেই যেখানে মানুষ শত কারণে মেলে। মেলে যখন তখন হরেকরকম মাল বিক্রেতারা জোটে। সেইসব কিনবার জন্যে আবার মানুষ জোটে। ধীরে ধীরে মেলা যে-কারণে বসানো হয় তা যায় হারিয়ে। কেন্দুলি তথা কেন্দুবিল্বের মেলা হাজার বছর আগের আদি বাঙালী কবি-গায়ক জয়দেব ঠাকুরকে স্মরণে রাখবার জন্যে কত শত বৎসর ধরে রাঢ়ের সেই গ্রামে বসে আসছে। জয়দেব হয়েছেন বিস্মৃত বাঙালীর স্মৃতি থেকে। বাংলাদেশে সংস্কৃত কেউ পড়ে না। পশ্চিম বঙ্গে যদি বা কিছু লোকে পড়ে এখনো সাহিত্যাস্বাদ করবার জন্য কমই পড়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ হারিয়ে যায় বাঙালীর কাছ থেকে। কিন্তু ঐ কাব্যের সবটাই তো গীতগোবিন্দের। ভারতবর্ষের সর্বত্র তা সঙ্গীতের লোকেরা গায়, বিশেষ করে গায় নাচের লোকেরা। উপমহাদেশের চারটি প্রধান নৃত্যশৈলীর মধ্যে তিনটির প্রধান নির্ভর জয়দেবের গান। মণিপরী, কত্থক, ভরতনাট্যম। বাংলাদেশের সিলেটে মৌলভিবাজারে অনেক মণিপুরী পরিবারের সম্ভবত টিকেন্দ্রজিতের আমল থেকে। তারা সবাই নাচে, গায়। গায় জয়দেব, বাঙালী গায় না, নামটাও জানে না। ভারতবর্ষ গায় কেন? গানগুলি অপরূপ কাব্য বলে, অপূর্ব সঙ্গীত বলে। জয়দেবের কাব্যে ছন্দের ললিত ঝঙ্কার বালক রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার কবিকে, পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ছন্দনির্মাতাকে দেয় জাগিয়ে। ষোল-সতেরতে তিনি ভানুসিংহ ছদ্মনামে বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচে ধাঁচে এক প্রস্থ গান রচনা করেন, পদাবলীকার মহাজনদের ভাষায়। ভানুসিংহ ঠাকুরের এই গানগুলিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে পরে আর খুব মূল্য দিতেন না। শুধুই 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' আর 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' গান দুটিকে তিনি জায়গা দেন তাঁর কাব্য সঙ্কলনে। কিন্তু গান হিসেবে সবগুলোই প্রায় উৎকৃষ্ট। অদ্ভুত তার সুর। বৈষ্ণব কবিতা, কীর্তনাশ্রয়ী সুরই তার জন্য সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু ভানুসিংহের গানের আমাদের জানাশোনা কীর্তনের কোনই মিল দেখা যায় না। অনুমান করি জয়দেবের রচনা রবীন্দ্রনাথ গান হিসেবেই শুনেছিলেন এবং তার প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব গানে। 'আজু সখি মুহু-মুহু গাহে পিক কুহু কুহু' গানেতে কীর্তন খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু এটি সম্ভবত পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গান, সর্ব বিচারে। জয়দেবকে তো ভুলেছি, রবীন্দ্রনাথকেও কি ভুলে যাব একদিন? 'আজু সখি' ক'জন গায়, ক'জন শোনে। বাঙালী জাতিটাই কেমন যেন মননবিমুখ, সৌন্দর্যবিমুখ হয়ে পড়ল পঞ্চাশ বছরে– ইংরেজ বিদায়ের বিচিত্র স্বাধীনতার কালে। থাকছে না তার কোনই অতীত স্মৃতি, শিল্পসংস্কৃতির ভাণ্ডার। জীবকুলের শত সহস্র জাতি হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের অত্যাচারে। তাই নতুন চেতনার সঞ্চার হচ্ছে মানবে, জীববৈচিত্র্যকে ধরে রাখতে হবে। বাঙালীর শিল্প যাচ্ছে, সংস্কৃতি যাচ্ছে, স্মৃতি যাচ্ছে, গৌরববোধ যাচ্ছে, বাঙালিত্বই, বাঙালীর চেতনা নেই যে-বিষয়ে। বাঙালী ভয়ঙ্কর রকম মাতৃভাষাবিমুখ হয়ে পড়ছে, যেন আগ্রহ করেই।

বাণিজ্যমেলায় যাব কেন, বাণিজ্য করি না, করিনি কোন কালে, করব না, অলক্ষ্মীই থাকব। তাতেই কি তাঁর সতীন আমাকে কৃপা করবেন? সত্তর-প্রায় বয়সে এসে বোধ হচ্ছে সেই কপালও আমার নেই। ঠিক যেন বাংলাদেশই একটা আমি। লক্ষ্মীকে হারিয়েছে অনেক দিন, সরস্বতীতে নেই রুচি। দীপালি বাণিজ্যমেলায় যাবে-নিতান্তই কৌতূহল, কেমন আন্তর্জাতিক, কেমন বাণিজ্য। যেতে হয় আমাকে।

ভাবি, মানুষ তো দেখি। শুক্রবার, নেই হরতাল। প্রথমে ভিড় দেখি, মানুষ পাই না। একজন টিকেট কেটে নিয়ে আসে। দশ দশ টাকা টিকেট। হাতে নিয়ে দীপালি চেঁচিয়ে ওঠে, একী, এ যে সব ইংরেজিতে লেখা। টিকেট হাতে নিই। সত্যি, একটি বর্ণ বাংলা নেই কোথাও। পরদিন বিকেলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সংবর্ধনা, ভাষা আন্দোলনের নায়কদের জন্যে। তাতে আমারও নাম দিয়েছে, টেলিফোন করে বলেছে যেন সময়মত যাই। প্রতিবাদ করেছি, বাহান্নতে আন্দোলনের ত্রিসীমানায় ছিলাম না। গ্রামে ছিলাম, ২৪ তারিখে ঢাকা পৌঁছে আন্দোলনের কেন্দ্রে পৌঁছাবার কোনই পথ পাইনি। ঢাকাটা সে কয়দিন স্বাধীন ছিল, যেমন স্বাধীন হয়েছিল পরে ষোলই ডিসেম্বর, একাত্তরে। কোনই শাসন ছিল না। ছাত্রের দল কোথাও কোথাও শাড়ি পেতে চাঁদা তুলছে আন্দোলন চালাবার জন্যে। স্বাধীনতার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াই ক'দিন। তারপর পাকিস্তান ফিরে আসে, টানা একুশ বৎসরের জন্যে। আমার অনুপস্থিতির প্রায়শ্চিত্ত করেছি প্রাণপণ। গাজিউল হকের অনুজ নিজামের সঙ্গে কিছু কিশোরকিশোরী নিয়ে বাঁশের কামানি ঘের দেওয়া শাহাদৎ-স্থল, ভবিষ্যতের শহিদ মিনার, তার চারপাশে দাঁড়িয়ে গান করেছি– একটি বছর ওই ছিল একুশের সব অনুষ্ঠান। হারমোনিয়াম কাঁধে এ বাদেও কয়েকবারের শহিদ দিবসে দল নিয়ে মিছিল

করেছি। আবুল খয়ের লিটুর মা খালাদের নিয়ে রাত্রি জেগে প্রগতি সংঘের একুশের প্রস্তুতি করেছি। ওতে আমি কিছু বিশিষ্ট আন্দোলনকারী হয়ে যাই না। চুয়ান্নতে ব্রত নিই জীবনে কখনো ইংরেজি বলব না যদিও আগের বছরই ইংরেজি সংবাদপত্রে যোগ দিয়েছি। একটানা সাতচল্লিশ বৎসর পেশার কারণে ইংরেজি লিখেছি, কিন্তু বলিনি একটি পূর্ণ বাক্য সে ভাষায়। আটানব্বইয়ে মাহফুজ আনাম আমার পরমোপকার করেন, ইংরেজির গোলামি থেকে মুক্তি দেন। চাকরিহারা হয়ে আমি মনের আনন্দে বাংলা লিখে বেড়াচ্ছি যত্রতত্র–এবং সারা দিন, সারা মাস, সারা বছর। একটিও ইংরেজি বাক্য লিখিনি চাকরি ছাড়বার পর। বাংলার ব্যাপারে কোথাও কোথাও হয় তো আমার একটা আপোসহীন দুর্বাসা মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকবে– কিন্তু এই সমস্তকে কয়েকবার গুণ করলেও আমি ভাষা আন্দোলনের কর্মী পর্যন্তও হতে পারি না। তবু যাই সংবর্ধনায়। উপহার পেতে ভালই লাগল। আয়োজনা বিশেক সংবর্ধিত হলেন, সকলেই বন্ধু আমার, তাঁদের গৌরবে আমার গৌরব–কিন্তু তাঁরা তাদের কীর্তিসূত্রে প্রণম্য আমার। আমি কিছু বলতে অস্বীকার করি, অধিকার বোধ করি না বলে। কিন্তু ঘোষক গোলাম সারোয়ার ও পরে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে খুব গুরুত্বসহকারে বলি বাণিজ্যমেলার টিকেট নিশ্ছিদ্র ইংরেজিতে, মাইকে প্রতিবাদ কর, নিন্দা কর, মেলা কর্তৃপক্ষকে সাবধানবাণী দাও। বাচ্চু দ্বিধান্বিত হল কিছুটা, বললো আন্তর্জাতিক মেলা বলে হয়তো করে থাকবে। জার্মেনিতে, স্পেনে, ইরানে, ইরাকে, জাপানে, ঘরের কাছে থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক মেলায় কি ইংরেজিতে টিকিট ছাপে? বাচ্চু বোঝে। মাতৃভাষা দিবসকে, একুশেকে অপমান করার জন্যে, অর্থহীন করে তুলবার জন্যে পাকিস্তান থেকে কিংবা স্থানীয় আইএসআই এজেন্ট কিংবা জামায়াত ইত্যাদির দালালের প্রয়োজন পড়ে না, প্রচুর খাঁটি বাঙালি একাজে সদাতৎপর থাকে। মনে হচ্ছে থাকবে

এবারের বিশেষ একুশে, বিশেষ গৌরবের একুশে উপলক্ষ্যে সরকার বাংলা ভাষার উপকার হয় এমন কী করেছে? কোন কালে কোন সরকারই কিছু করে না বটে কিন্তু এবারে তো ব্যাপারটা হবার কথা ছিল। হওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

আরো অনেক দিন।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের একুশে অনুষ্ঠানমালার মঞ্চে বসে মনে পড়েই গেলো, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল এবার একুশেতে তারা রাস্তায় প্রকাশ্যে দৃশ্যমান সমস্ত ইংরেজি বিজ্ঞাপন ও নামফলকের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। করেনি কিছুই তারা সেই লাইনে। জোট আর সরকার যেন একই ধারায় একুশে পালন করল এবার। এবারের বিশেষ একুশে, বিশেষ গৌরবের একুশে উপলক্ষ্যে সরকার বাংলা ভাষার উপকার হয় এমন কী করেছে? কোন কালে কোন সরকারই কিছু করে না বটে কিন্তু এবারে তো ব্যাপারটা হবার কথা ছিল। হওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। সরকারি কাজের ধরনটা খুব মজার। বড় গলায় বলে শিক্ষাখাতে সবচাইতে বেশী খরচ। বছর বছর হাজার হাজার কোটি খরচ হয় শিক্ষার পিছনে। ঠিক শিক্ষায় নয়। শিক্ষা-শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা যোগ্য শিক্ষকের দ্বারা–যদি এর এক শতাংশ পেত, দেশটা স্বর্গপুরী হয়ে যেত। ঠিকাদার খায়, ঘুষে যায়, বারো ভূতের পোয়াবারো। ক্লাস হয় না, শিক্ষক ক্লাস নেয় না, শুধু নোট দেয় মুখস্থ কিংবা

নকল করবার জন্য। জবা
রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের
ঢাকায়। অধ্যক্ষা এই পর্যন্ত
করেননি, করতে দেননি ব
একটা জিয়াউর রহমান প্রতি
ক্রীড়ায় উন্নতি নেই বাংলাদে
তাই ক্রিকেটে পনের জন
সাকুল্যে ত্রিশটা নবীন মানুষ
শত কোটি খরচ হলেও
নেই, মানোন্নয়ন নেই, জবা

এবারের একুশে বিশে
কৃতিত্ব চায় তার, সঙ্গতভা
সরকার একুশেকে সার্থক ক
কী করেছে। কিছুই চোখে
কাদের বলুন বাংলার প্রসা
এবার বিশেষ কী পদক্ষেপ
করি নিরুত্তর থাকতে হবে
আনুষ্ঠানিকতার যুগ। সরব
অনুষ্ঠানসর্বস্ব আত্মপ্রচারস
মধ্যে নেই বিন্দুমাত্র।
করবার ছিল। এখনো আ
প্রণয়ন ছাড়াই, কেবলমাত্র
সম্পন্ন হতে পারে তার থে

এক. নির্ভেজাল বিদেশী
থাকতে পারবে না রাস্তায়,
প্রকাশ্য স্থানে। প্রকাশ্য
নামফলকও নিষিদ্ধ হবে প
দৃশ্যগত দূষণ বলে।

দুই. সর্বপ্রকার বিক্র
মোড়কে প্রধানত বাংলায় প
হবে।

তিন. এদেশীয় নাগ
করলে কোন ধরনের বিদ্যা
করা যাবে না, বাঙালি
বাধ্যতামূলক ক্লাস থাকবে,
মূলত বাংলায় হতে হবে।

চার. সমস্ত সরকারি প্র
ভবনের নাম বাংলায় হ
বিসিআইসির মত অ্যাক্রনি

পাঁচ. নিম্নতম থেকে উ
বাংলায় হতে হবে।

ছয়. বাংলা একাডেমি
অনুবাদ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠ
বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা
ভাষায় অনুবাদের কাজ চল

সাত. বাংলা একাডেমি
ভাল কথা, বাংলা ভাষা
নানা স্তরের।

আট. পৃথিবীর খ্যাতন
বাংলা বিভাগ খোলাবার জ
সরকার।

নয়. একটি আন্তর্জাতি
উদ্যোগ যার ছাত্র সংখ্যার
এবং যার বিষয় প্রধানত
সাহিত্য, বাঙালীর শিল্প ও
এই তালিকা ক্ষণমাত্র
অধিকাংশ সরকার, আ
বছরের মধ্যেই সম্ভব ব
অধিকাংশ কেন, সবই প
বাংলার স্বপক্ষে তাঁরা
যোগ্যতা দক্ষতা তাদের
নগরের চেহারা ও ঢাকা
ভিতরটা তারা বদলে
তালিকাটি বাস্তবে রূপা
ফেরা আরম্ভ হবে।

দুইটা সামরিক এব
বছরের একটানা স্বৈরশা
নেই অন্তরে বাইরে। এ
আরম্ভ করুক সরকার
কর্তব্যের সাধন দায়িত্ব
অন্য কোন মন্ত্রণাল
প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি
দায়িত্ব নিতে হয়।
বাংলাদেশকে সুস্থ কর
তুলবার।

ওয়াহিদুল হক : সাংবাদিক